বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল

ISSN 2074-2134

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল ‹› সংখ্যা : ১১/ ডিসেম্বর ২০১৬

Bangladesh Film Archive Journal ‹› Issue : 11/ December 2016

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত ষান্মাসিক জার্নাল।

Bangladesh Film Archive Journal
An Biannual Journal Published by
Bangladesh Film Archive, Dhaka.

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল ‹› Bangladesh Film Archive Journal
নবম বর্ষ/সংখ্যা : ১১/ ডিসেম্বর ২০১৬ ‹› Ninth Year/Issue : 11/ December 2016
স্বত্ব @ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ / Copyright @ Bangladesh Film Archive
ISSN : 2074-2134

প্রচ্ছদ : *মুখ ও মুখোশ*-এর একটি স্থিরচিত্র

সম্পাদক
Editor
মো. জাহাঙ্গীর হোসেন
Md. Jahangir Hossain

উপদেষ্টা মণ্ডলী
Advisors
মো. জাহাঙ্গীর হোসেন
Md. Jahangir Hossain

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
G. N. Nazmul Hossain Khan

মোসলেমা নাজনীন
Moslema Naznin

মোরশেদুল ইসলাম
Morshedul Islam

অনুপম হায়াৎ
Anupam Hayat

অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম
Prof. Dr. Md. Aminul Islam

চিন্ময় মুৎসুদ্দী
Chinmoy Mutsuddi

সাজেদুল আউয়াল
Sajedul Awwal

মাহমুদুল হোসেন
Mahmodul Hossain

নির্বাহী সম্পাদক
Executive Editor
মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান
Mohammad Arifuzzaman

সূচিপত্র

০২ **সম্পাদকীয়**

চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রবন্ধ

০৩ **বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরাম-এর তিন দশকের চলচ্চিত্রযাত্রা**
সাজেদুল আউয়াল

১৩ **আবু সাইয়ীদ : সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় সন্ধানী চলচ্চিত্রকার**
ড. ফাহমিদুল হক

২৩ **চলচ্চিত্র গবেষণা : প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি**
ড. নাদির জুনাইদ

৩২ **বাংলাদেশের চলচ্চিত্র চর্চা ও আলমগীর কবির**
শৈবাল চৌধুরী

৩৭ **তথ্য সমৃদ্ধ দৃশ্য ধারক টেপ এবং এর ক্ষতিগ্রস্ততা ও প্রতিকার**
ড. মো. ছাবের আলী ও সেলিনা বেগম

৪০ **চলচ্চিত্র সংগীত-পরিচালক : পঙ্কজ মল্লিক**
পরিতোষ কুমার মণ্ডল

৪৪ **চলচ্চিত্রের গানে নদী : বাঙালির অন্তর্বেদনার রূপায়ণ**
স্মরণ প্রত্যয়

৫১ **বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংগীতে নারীর বিভিন্ন রূপ**
তিলোত্তমা সেন

চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ

৫৭ **A Critical Reading of Ray's *Charulata* : Transforming Words into Images**
Mohammad Aminur Rahman & Md. Mohiul Islam

৬২ ***অযান্ত্রিক*-এর আর্কিটাইপ বিতর্ক ও অন্যান্য প্রসঙ্গ**
রেজা মোহাম্মদ আরিফ

৭৪ ***কখনো আসেনি* চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গ**
সাহানারা এফ. চৌধুরী

৮০ **গৌতম ঘোষের *শঙ্খচিল* : বিষয় ও নান্দনিকতা**
অনন্ত মাহফুজ

বাংলাদেশ
ফিল্ম আর্কাইভ
জার্নাল
নবম বর্ষ/সংখ্যা : ১১/ ডিসেম্বর ২০১৬

৮৬ বাংলা চলচ্চিত্রে সম্পর্কের মেরুকরণ : *মা বড় না বউ বড়* চলচ্চিত্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
মো. মাহবুব সিদ্দিকী

৯২ *বেলাশেষে* : একুশ শতকের নারীর অবয়ব বিনির্মাণ
শবনম জান্নাত ও নিশাত পারভেজ

গ্রন্থ আলোচনা

১০২ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় বই 'চলচ্চিত্র : অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ'
ড. সাজ্জাদ বকুল

সাক্ষাৎকার

১০৬ পঞ্চাশের দশকে কোনো মেয়ের চলচ্চিত্রে অভিনয় করাকে ভালো চোখে দেখতো না আমাদের সমাজ : পেয়ারী বেগম
সৌমিক হাসান

পুরানো সেই দিনের কথা

১১২ চলচ্চিত্র ও বাঙালি মুসলমান
অনুপম হায়াৎ

পাঠকের প্রতিক্রিয়া

১১৫ 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল' ১০ম সংখ্যা : পাঠ-উত্তর ভাবনা
মাসুদ নিক্সন

১২০ চলচ্চিত্র জগতের ভ্যানগার্ড 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল'
বাবু রহমান

প্রতিবেদন

১২২ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ওয়েবসাইট ও চলচ্চিত্র
টিনা বড়ুয়া

পরিশিষ্ট

১২৭ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনাসমূহ : ৪৫টি
১২৮ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের গবেষণাসমূহ : ৫০টি

সম্পাদনা সহযোগী
Associate Editor
মো. হাবিবুল্লাহ আল আহাদ
Md. Habibullah Al Ahad

সম্পাদনা সহকারী
মো. ফজলে রাব্বি

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
সাজেদুল আউয়াল

বানান সমন্বয়ক
শাহাদৎ রুমন

গ্রাফিক্স
ম্যাডহর্স, ১২৫ (বেইজমেন্ট) আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
madhhorse.titian@gmail.com

মুদ্রণ : আহসান প্রিন্টার্স

মূল্য : ১০০ টাকা (**Price :** US $ 10)

পরিবেশক
প্যাপিরাস ও পাঠক সমাবেশ
আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

যোগাযোগ
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ ভবন (তৃতীয় তলা)
১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Contact
Bangladesh Film Archive
National Broadcasting Authority Building
(2nd Floor) 121 Kazi Nazrul Islam Avenue
Shahbag, Dhaka-1000

Phone : +88 02 967 22 59, 967 42 84
Fax : +88 02 966 73 77
E-mail : bfarchivebd@gmail.com
Website : www.bfa.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নালের ১১তম সংখ্যা যথাসময়ে প্রকাশিত হলো। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে চলচ্চিত্রসহ ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রামাণ্যচিত্র দক্ষতার সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছে। চলচ্চিত্র সংরক্ষণের বিষয়টি অর্থবহ, যুক্তিযুক্ত, আরও সুন্দর ও সাবলীল করতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এই জার্নাল।

চলচ্চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চলচ্চিত্র শিক্ষা ও গবেষণা, চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক, নান্দনিক ও কারিগরি দিক, চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্র বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা, বিশ্লেষণ সম্পর্কিত প্রবন্ধ এই জার্নালটিতে প্রকাশিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রথিতযশা লেখকগণ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধসমূহ লিখেছেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল ১১তম সংখ্যায় চলচ্চিত্র বিষয়ক ০৮টি প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র বিশ্লেষণ বিষয়ক ০৬টি প্রবন্ধ, ০১টি গ্রন্থ আলোচনা, ০১টি সাক্ষাৎকার, নিয়মিত বিভাগ পুরানো সেই দিনের কথা, জার্নাল দশম সংখ্যা সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া ০২টি এবং ফিল্ম আর্কাইভের ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত চলচ্চিত্রের উপস্থাপন সংক্রান্ত ০১টি প্রতিবেদন এ সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে বর্তমান সংখ্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা জার্নালটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছি। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হলে তা মার্জনীয়। জার্নালটি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও কর্মকুশলীদের কাজে আসবে বলে মনে করি।

মো. জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬।

বেলাশেষে : একুশ শতকের নারীর অবয়ব বিনির্মাণ

শবনম জান্নাত ও নিশাত পারভেজ

প্রসঙ্গের অবতারণা

সাম্প্রতিককালে এদেশে মুক্তি পাচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্র। সেই সূত্র ধরে কিছুদিন আগে বাংলাদেশের দর্শকরা বড়পর্দায় দেখে নিল নন্দিতা রায় আর শিবপ্রসাদ মুখার্জি পরিচালিত *বেলাশেষে (২০১৫)* চলচ্চিত্রটি। ভারতে রয়েছে একাধিক চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো সুপ্রাচীনকাল থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে আসছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের ছবিগুলোকে বিশ্ব দরবারে আসীন করেছেন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায় আর মৃণাল সেনের মতো গুণী পরিচালক। তাদেরই হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রে যে ধারাটি ক্রমশ প্রকাশমান, সেখানে নারী-পুরুষের রূপায়ণ কেমন, সেখানে ব্যতিক্রমগুলো কোথায় বা কেমনতর?

বেলাশেষে (২০১৫) চলচ্চিত্রটি নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া বলেছে—"সাধারণ গল্পের কারণেই *বেলাশেষে* (২০১৫) এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরিবারপ্রথা ধরে রাখার জন্য এ ধরনের চলচ্চিত্র আরো হওয়া উচিত।" পশ্চিমবঙ্গের মতই এদেশেও জনপ্রিয় হয়েছে ছবিটি। এর কারণ বাংলাদেশ ও কলকাতার আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে মিল রয়েছে। এমনকি মিল রয়েছে চলচ্চিত্রের নারী-পুরুষ এর চরিত্র নির্মাণ কিংবা পারিবারিক কাঠামো নির্ধারণেও।

ফরাসি দার্শনিক রুশোর মতে, "নারী পরিতৃপ্ত করতে পারে পুরুষকে এবং অধীনে থাকবে পুরুষের" (আজাদ, ১৯৯৫ : ৯৫)। আর সেটা করতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থার পদলেহী হয়ে পুরুষেরা নারীকে ধাপে ধাপে পিছিয়ে রাখতে চায় মূলধারা থেকে। সেটা করে দেখিয়েছেন আমাদের আলোচিত চলচ্চিত্রটির মূল প্রোটাগোনিস্ট বিশ্বনাথ মজুমদার। আর সমাজের এই পুরুষতান্ত্রিক চোখ ক্যামেরার মাধ্যমে কিংবা ছন্দ, বাক্য, লয়ে কীভাবে মিশে গেছে এই চলচ্চিত্রে তা নিয়েই এই প্রবন্ধ। এই চলচ্চিত্রের নারী চরিত্ররা যেন মিল্টনের ইভের মতোন আদমের কাছে আত্মসমর্পণ করে—

> আমার প্রণেতা ও ব্যবস্থাপক, তুমি যা আদেশ করো
> প্রশ্নহীন আমি মান্য করি; এ-ই বিধাতার বিধি;
> বিধাতা তোমার বিধি, তুমিই আমার: এর বেশি কিছু
> না জানাই নারীর সবচেয়ে সুখকর জ্ঞান ও গুণ।
> (আজাদ, ১৯৯৫: ২৩৪)

ফৌজিয়া খান প্রখ্যাত নারীবাদী লেখক লরা মালভির সহায়তা নিয়ে লিখেছেন, যে নারী চরিত্র সবসময়ই নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাসীন পুরুষ চরিত্রগুলোর কামনায় বস্তুগত। তিনি লিখেছেন—

> চলচ্চিত্রের বর্ণনায় পুরুষের চরিত্রেরা চোখ রাখে নারীদের দিকে। পুরুষ চরিত্রের কামজ দৃষ্টিকোণে দৃশ্যায়িত চলচ্চিত্র মিলনায়তনের দর্শককে এই পুরুষ ছবির সাথেই একাত্ম করে তোলে। (হায়াৎ, ২০১৩: ২৭)

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নারীরা এসেছে অধঃস্তন হিসেবে। কখনো মা, কখনো বোন, স্ত্রী, প্রেমিকা ইত্যাদি হিসেবে। পুরুষের সাথে সম্পর্কের ভিত্তি ধরে যদি একজন নারীকে দেখা হয় তাহলেও দেখা যাবে সিদ্ধান্তের ভূমিকাটাও পুরুষ চরিত্রটাই নিচ্ছেন। গীতি আরা নাসরীন-এর ভাষায়, পর্দায় নারী ও পুরুষ চরিত্র নির্মিত হয় একটি অপরটির সম্পূরক হিসেবে, অর্থাৎ পুরুষ যা, নারী তা নয় হিসেবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মূলধারার চলচ্চিত্র নায়ক-নির্ভর এবং নায়কই মূল ঘটনার সংগঠক হয়ে থাকেন (নাসরীন, ২০০৩)। নারী নির্মাতা কিংবা কাহিনিকারের মতো নীতিনির্ধারণী জায়গায় আসার পরেও সবকিছুকে দেখছেন পুরুষের চোখ দিয়ে। চরিত্র নির্মাণ করছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। নারী চরিত্র রূপায়ণে চলচ্চিত্রের কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। এ সম্পর্কে বেসিংগার বলেছেন : ক) নারীকে ভালো খেলোয়াড়ের মতো ত্যাগী মনোভাবসম্পন্ন হতে হবে; খ) নারী খল চরিত্রের যেন না হয়; গ) চলচ্চিত্রে চার ধরনের মা দেখা যায়, যেমন- অবিবাহিত, নিখুঁত, ত্যাগী ও ধ্বংসকারী। (বেসিংগার, ১৯৯৩ : ৩৯২)

প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব পর্যালোচনা

চলচ্চিত্র মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে। সে জীবন কার? পর্দার সামনে থাকা পুরুষ বা নারীর, নাকি চলচ্চিত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সব ক্ষমতাশালী পুরুষদের? সমাজ পরিবর্তন ও ব্যক্তি মানস গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণেই চলচ্চিত্র মাধ্যমটিতেই আসতে হবে পরিবর্তন। ক্ষমতাবান পুরুষদের পাশ কাটিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের লড়াইয়ে আসা নারীদের জন্য বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে চলচ্চিত্র। *বেলাশেষে (২০১৫)* চলচ্চিত্রের পরিচালকদ্বয়ের একজন নন্দিতা রায়, যিনি এই ছবির কাহিনিকারও বটে। নন্দিতা নিজে একজন নারী পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখনী বা পরিচালনা দুটোর মধ্য দিয়েই যেন কর্তৃত্ববাদী পুরুষের দৃষ্টিকেই প্রতিফলিত করেছেন।

এ গবেষণায় গুণগত আধেয় বিশ্লেষণের ন্যারোটোলজির আশ্রয় নেয়া হয়েছে, কাহিনিতে কীভাবে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বা অসংবেদনশীলতা তৈরি করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই অর্থকে তারপর গুণগত আধেয় বিশ্লেষণকে রেপ্রিজেন্টেশন ও সমালোচনাত্মক ধারায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্টুয়ার্ট হলের মতে—রেপ্রিজেন্টশন ধারার ডিসকার্সিভ অ্যাপ্রোচে কীভাবে জ্ঞান উৎপাদন করে তা দেখা হয়। আলোচ্য গবেষণায় চলচ্চিত্রের কাহিনি, শব্দ প্রক্ষেপণ তথা কথোপকথন, চরিত্র বিশ্লেষণ, গান আর ছবি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডিসকোর্সকে পর্যালোচনা করা হবে। আবার ভাষা কেন, কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার হচ্ছে তা উদ্ঘাটনের জন্য ডিসকোর্সের আলোচনা করা হবে।

চলচ্চিত্র সমাজের নারী পুরুষের ভূমিকার চিত্রায়ণ করে। আলোচ্য চলচ্চিত্রটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে নারীর মর্যাদার অবনমন। ফাহমিদুল হক নারী পুরুষের এই ভূমিকার কথাই তুলে ধরেছেন এভাবে : "চলচ্চিত্র সমাজকে প্রতিফলিত করতে গিয়ে নারীর যে আদর্শবাদী ও সামাজিক নির্মাণ চলচ্চিত্রে উঠে আসে, যেখানে সে হয় নন্দিত (কুমারী হিসেবে) অথবা নিন্দিত (পতিতা হিসেবে)।" (উদ্ধৃত হাস্কেল, হক, ২০১০: ৫৯)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীকে যে ভূমিকায় দেখে বা দেখতে চায় তাই ফুটে উঠে ক্যামেরায়। লরা মালভির ভিজ্যুয়াল প্লেজার এন্ড ন্যারেটিভ সিনেমা (১৯৭৫) গ্রন্থতে বলা হয়—চলচ্চিত্রে পুরুষের দৃষ্টিতে নারী প্রদর্শিত হয়। আর ওই পুরুষ চরিত্রের মধ্যে দর্শক নিজেকে খুঁজে পায়। তিনি বলেছেন, মূলধারার চলচ্চিত্র যৌন কামনাকে প্রাধান্যশীল পিতৃতান্ত্রিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছে। তিনি আলোচনা করেছেন যৌনতুষ্টি নিয়ে, তার অর্থ এবং বিশেষত নারীর ইমেজকে কেন্দ্রে রেখে পরস্পরযুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে চলচ্চিত্রের অনেক সম্ভাব্য তুষ্টির মধ্যে একটি হলো স্কোপোফিলিয়া বা দেখনপ্রিয়তা। অর্থাৎ, পর্দায় নারীর উপস্থিতি দেখানো হয় পুরুষের ভালো লাগাকে কেন্দ্র করে। সেখানে ক্যামেরার দৃষ্টি, সিনেমার নায়কের দৃষ্টি এবং পরিচালকের দৃষ্টি এই তিনটি দৃষ্টিই থাকে দর্শকের। অন্যদিকে চলচ্চিত্রগুলোতে পুরুষ ফ্যান্টাসিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্য অর্থে ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসেবে সে হাজির হয়।

চিত্র-১ : *বেলাশেষে* চলচ্চিত্রে স্বামীকে প্রণাম করছেন আরতি দেবী।

বর্তমান গবেষণায় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের *বেলাশেষে (২০১৫)* চলচ্চিত্রে নারী ও পুরুষের সংলাপ, পোশাক, উপস্থিতি এগুলোর মাধ্যমে নারীর চিত্রায়ণ ও এর সম্ভাব্য অর্থ বিশ্লেষণ করা হবে।

কাহিনি সংক্ষেপ

কলকাতার কোনো এক মজুমদার পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয় *বেলাশেষে* (২০১৫) চলচ্চিত্রের কাহিনি। পরিবার প্রধান বিশ্বনাথ মজুমদার, পেশায় প্রকাশক। স্ত্রী আরতি মজুমদার। পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনী নিয়ে তাঁর একান্নবর্তী সংসার। পুত্র, পুত্রবধূ ছাড়াও তিনটি কন্যা নিজ নিজ স্বামী, সংসার, সন্তান নিয়ে যে যার মতো ব্যস্ত। চলচ্চিত্রের কাহিনি শুরু হয় অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন মৃত লেখকের স্ত্রী বিশ্বনাথ মজুমদারের কাছে এসে নিজের অর্থনৈতিক দৈন্যের কথা বলে সাহায্য চান তার কাছে। তিনি জানান যে, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় কি টাকা পয়সা রেখে গেছেন সে বিষয়ে কিছু জানেন না তিনি। শুধুমাত্র একটা পাণ্ডুলিপি আছে, সেটা তিনি ছাপাতে চান। সেই উদ্দেশ্যেই বিশ্বনাথের কাছে আসেন তিনি। এসব শুনে বিশ্বনাথ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে শঙ্কিত হন এই ভেবে তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রীও এ ধরনের সমস্যায় পড়তে পারেন। বিশ্বনাথের স্ত্রী সম্পূর্ণ সংসার কেন্দ্রিক একজন মানুষ। স্বামী-সন্তান- নাতি-নাতনী নিয়ে যার ব্যস্ততা। স্ত্রীকে স্বাবলম্বী করতে বিশ্বনাথ ডিভোর্স ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পান না। তাই দুর্গাপূজার নবমীতে সব ছেলে-মেয়েকে উপস্থিত থাকতে বলেন। দশমী তথা বিজয়ার দিনে বিশ্বনাথ স্ত্রী সন্তানদের জানালেন ৪৯ বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি টানতে চান ডিভোর্সের মাধ্যমে। স্ত্রী এ ঘটনা বিশ্বাস করতে চান না। কোর্টে পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় এবং সেখানে সবকিছু শুনে বিচারক তাদের পরামর্শ দেন ১৫ দিন একসাথে কোথাও ঘুরে আসতে। বিশ্বনাথের পরিবার ঠিক করে তারা ১৫ দিনের জন্য শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যাবে। বাবা-মায়ের সম্পর্ক জোড়া দিতে উঠে পড়ে লাগে সন্তানেরা। তারা লুকিয়ে ক্যামেরা ফিট করে বাবা-মায়ের রুমে। বাবা-মায়ের সংসার ঠিক করতে গিয়ে নিজেদের অন্তঃসারশূন্য সংসারগুলোকে জোড়া দিতে থাকে বাকি ৪ জোড়া দম্পতি অর্থাৎ বিশ্বনাথের সন্তান-সন্ততিরা। কিন্তু বাবা-মা'র সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে অসমর্থ হয় তারা। শেষমেশ ঠিক হয় বাবা থেকে যাবেন শান্তিনিকেতনের বাড়িতে আর মা চলে যাবেন কলকাতা। সেখানে গিয়ে আরতি দেবী স্বাবলম্বী হবার যুদ্ধে লিপ্ত হন। এরকমই কোনো একসময়ে ঠিক তাদের ৫০তম বিবাহবার্ষিকীর আগে বিশ্বনাথ ফিরে আসেন এবং নিজের দোষগুলো স্বীকার করে নেন। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সবাই মিলে বিশ্বনাথ-আরতির ৫০তম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে।

ফলাফল বিশ্লেষণ

স্ত্রী যেন ক্ষমার আধার

চলচ্চিত্রের একেবারে শেষে এসে দেখা যায় স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছেন বিশ্বনাথ মজুমদার। আর স্ত্রীও পতি অন্তপ্রাণ নারীর মতো মেনে নিয়েছেন স্বামীকে। অথচ স্ত্রীর কোনো কিছুকেই কিন্তু সহজে নিতে পারতেন না স্বামী। বার বার ক্ষমা করে দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাঙালি নারীদের চিরায়ত রূপটাকেই তুলে ধরেছেন পরিচালকদ্বয়।

তাদের যৌবন বয়সে স্ত্রীর জন্মদিন মনে রাখতে না পারাকে যেমন ক্ষমা করে দিয়েছেন, তেমনি ক্ষমা করেছেন অসুস্থ সন্তানের প্রতি বিশ্বনাথের অবহেলাকেও। ৪৯ বছর পরও 'উনার' সুখের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়াকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করেছেন আরতি দেবী।

একেবারে শেষ দৃশ্যের কথোপকথনেই এর প্রমাণ মেলে। স্বামীর জন্য ৪৯ বছর পর স্বাবলম্বী হলেন আরতি। কিছুদিন পর ফিরে এলেন বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ : আসবো?
আরতি : যাওয়ার সময় বলে যাওনি তো।
বিশ্বনাথ : কি রকম আছো তুমি? খুশি হওনি আমি ফিরে এসেছি বলে? তোমার চোখে মুখে যে সেই খুশি নেই?
আরতি : খুশি নই তো! একদম খুশি নই। আমাকে কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে খুশি হয়ে, [...] তুমি আমাকে স্বাবলম্বী করতে চাও? হতে হবে। খুশি হয়ে। এখন আমি ব্যাংকে যাই, স্টেট ব্যাংকে ১০ লাখ আছে [...] ইয়ারলি ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ১ লাখ ১০ হাজার। ঠিক বললাম? কনকদের বস্তিতে গিয়ে মেয়েদের সেলাই শেখাই, স্বাবলম্বী হয়েছি।
বিশ্বনাথ : কিন্তু আমি তো তোমাকে ছেড়ে আলাদা থাকতে পারলাম না!
আরতি : কেন?
স্বামী : সকাল বেলার চা'টা সে এক রকম করে নিজেই বানিয়ে নেই, কিন্তু বিকাল বেলার চা'টা একা খেতে ইচ্ছে করে না। এই বয়সে একাকিত্ব জিনিসটা বড় ভয়ংকর। আমার সমসাময়িক বন্ধু যারা সব এক এক করে চলে যাচ্ছে। ওখানে আমার সাথে ঝগড়া করার মতোও তো কেউ ছিল না। আমার জামাটার গন্ধ শুঁকে যে কাঁচতে দেবে এমন কেউ তো ছিল না। আরতি, ৫০ বছর ধরে তুমি আমার জুতো খুঁজে দিয়েছো, তুমি তো স্বাবলম্বী হতে পেরেছ। আমি পারিনি। আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।
[...]
জানো, এতদিন পর বুঝতে পারছি প্রকাশক ও লেখকের সম্পর্ক আসলে স্বামী-স্ত্রীর মতন। লেখক থাকে ভেতরে আর বাইরে থাকে প্রকাশক। তুমি আমার জীবনের লেখক আরতি।

স্ত্রীকে যখন বিশ্বনাথ ডিভোর্স দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে পারেননি। ৪৯ বছর ধরে সংসার করে তিনি

চিত্র-২ : *বেলাশেষে* বিশ্বনাথের প্রতি আরতির বক্তব্য : "বাইরেরটা তুমি সামলাবে, ভেতরটা আমি, তাইতো কথা ছিলো?"

জীবনে আরতি দেবীর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন, তা শুধুমাত্র বিকেলের চা পান কিংবা জুতো খুঁজে দেয়ার জন্য। শেষ মুহূর্তেও তিনি স্বীকার করেননি, তিনি যে বাইরে একজন সফল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তা স্ত্রীর সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না। এমনকি এহেনও অপরাধ করার পরও স্বামীর মন গলানো কথা শুনে স্ত্রী ভুলে গেলেন বিনা অপরাধে তাকে কোর্টে হাজির করেছিলেন স্বামী বিশ্বনাথ। ঘরসুদ্ধ সন্তান-সন্ততি, নাতি নাতনির সামনে স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কিছু পাননি বলে বক্তব্য রেখেছেন। এত অপমানের পরও স্বামী ফিরে এলে ঠিকই তাকে নিজের করে নেন স্ত্রী, এমনকি ঠাকুরকে প্রণাম করে তার কাছে চাইলেন তার মৃত্যুর আগে যেন স্বামীর মরণ হয়, কারণ তাকে ছাড়া স্বামী চলতে পারবেন না। সেই স্বামী যিনি বলেছিলেন তার স্ত্রীর কাজগুলো খুবই তুচ্ছ যা একটা ঝিকে দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়।

স্বামীত্ব পুরুষের আলঙ্করিক পদ–রয়েছে কর্তৃত্ব, নেই দায়িত্বের দায়

নন্দিতা-শিবপ্রসাদ পুরুষের যে চেহারা তুলে ধরেছেন আসলেই কী তাই হয়। বাস্তবে কী আমাদের বাবাদের সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা এতই কম। স্ত্রীকে নিজের থেকে আলাদা করার জন্য সন্তানদেরই বারবার দায়ী করেছেন বিশ্বনাথ মজুমদার। অথচ এরা তারই ঔরসজাত সন্তান। এমনকি বিচারকের পরামর্শে যখন শান্তিনিকেতনের বাড়িতে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তেও তিনি বলছেন, 'যেতে বলেছে আমাদের দুজনকে।'

আবার নবপরিণীতা স্ত্রীকে ঘরে এনে নিজের পিতার দায়িত্ব ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে বিশ্বনাথ চাইতেন আলতা আর নুপূর পায়ে স্ত্রী তার ঘরে এসে দাঁড়াক। নিজের সন্তান কিংবা পিতা-মাতার প্রতি এত মমত্বহীনতা কোন দেশি পিতাদের প্রতিনিধিত্ব করছে? মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের সাথে চরিত্রটি বেশ বেমানান বটে।

৪৯ বছর পর বিশ্বনাথ বাবুর মনে হলো আরতি দেবী আর তার সম্পর্কটা পুরোটাই অভ্যেস। কিন্তু তিনি নিজেকে কতটুকু

'বেটার হাফ' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার কোনো জবাবদিহি তাকে করতে হয়নি আরতি দেবীর কাছে। কোনো সাংসারিক কাজে সহায়তা তো দূরে থাক, স্ত্রীর যে শখের কোনো বিষয় থাকতে পারে তা তার মনেই হয়েছে ৪৯ বছর পর। তাও আবার এভাবে 'কই কখনো বলোনি তো'। অর্থাৎ স্ত্রীর মনের খবর জানতে চাওয়ার দরকার তার নাই। নিজের কথা নিজেকেই বলতে হবে স্ত্রীর।

লাইব্রেরির সদস্য হওয়ার ফর্ম এনে দিতে পারেন কিন্তু সাহিত্যের আড্ডায় স্বল্পশিক্ষিত স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সাহস করতে পারেন না বিশ্বনাথ মজুমদার। মননে আধুনিক দাবি করলেও প্রথাগত পুরুষ সমাজের প্রতিভূ তথা স্বামীই তো হয়ে রইলেন তিনি।

দেবতাজ্ঞানে স্বামীকে বার বার প্রণাম করেন আরতি। সেই স্বামী দেবতা ৪৯ বছর ধরে জানেন না স্ত্রী'র কী পছন্দ। অথচ স্বামীর কখন কি লাগবে তা স্ত্রীর মুখস্ত। শান্তিনিকেতনের বাড়িতে তাদের কথোপকথনেই তা স্পষ্ট—

আরতি : আমি প্রবোধবাবুর লেখা পড়েছি।
বিশ্বনাথ : কি করে পড়লে?
আরতি : ঐ যে! একটা করে বাড়তি কপি তুমি বাড়িতে আনতে। তুমি যখন চলে যেতে, আমি দুপুর বেলায় পড়তাম, কোনদিন বলিনি তোমাকে! তুমি যদি রেগে গিয়ে আর বই না আনতে।

বাহিরটা তুমি সামলাবে, ভেতরটা আমি

যুগ যুগ ধরে এই কথাটি বলতে হচ্ছে বাঙালি নারীদের। চিরাচরিত বাক্যটিই আবার পুনর্ব্যক্ত করলেন আরতি দেবী। স্বামীর জুতা খুঁজে রাখা থেকে শুরু করে সন্তান পালন, রান্না করা, কাজের লোকদের সামলানো এত কিছু করে কেন আরতি দেবী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খুলতে জানেন না কিংবা কেন কয় টাকা কোন অ্যাকাউন্টে আছে তা জানেন না—এটাই হয়ে যায় আরতি দেবীদের দোষ। তবে আরতি দেবীর উত্তরটা এখানে ছিল দারুণ, কার জন্য কোন চায়ের পাতাটা দেয়া হয় সেটা স্বামী মহাশয় জানেন কি না এটার উত্তর জানতে চেয়েছেন তিনি।

এমনকি সম্পত্তির ভাগ হলে কন্যারা নাও পেতে পারে এমন আশঙ্কাও আসে আরতি দেবীর মনে। মেয়ে মিলির সাথে কথোপকথনে তিনি বলে ওঠেন 'সম্পত্তি থেকে তোদের বাদ দিয়ে দিতে পারে।' ধরতে গেলে এটাও তো বাহিরের ব্যাপার, তাহলে তা নিয়ে আরতি দেবী কেন এত আগ্রহী তা বোধগম্য নয়। নারী নিজেই চায় অন্তঃপুরের দাসত্বের নিগড়ে বন্দি হয়ে থাকতে। আর এ কারণে সে আশ্রয় নিতে পারে রবীন্দ্রনাথের। কারণ গুরুদেব নারীদের জন্য ভেতরটা সামলানোর নির্দেশনা রেখেছেন নিজেরই কবিতার মাধ্যমে—

বন্দী হয়ে আছো তুমি সুমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষী, এই করুণ ক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্য-ভরা মানবের গেহে।
তাই দুটি বাহু'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কন দুটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
[...]
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে-
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।
(উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ, আজাদ, ১৯৯৫ : ১১৭-১৮)

কোর্টের সেই দৃশ্যে আবার ফিরে যাই—
বিশ্বনাথ : আমাদের বিবাহ সময়ের সাথে সাথে কতগুলো অভ্যেসে পরিণত হয়েছে। ওনার সংসার, সন্তান, নাতি-নাতনি, ওই প্রেসারের ওষুধ, স্যুগারের ওষুধ, কিছু দায়দায়িত্ব-অথবা ওই বধূবরণ সিরিয়ালের কাহিনি নিয়ে আলোচনা।

অর্থাৎ নারীরা কেবল সংসারই বোঝেন, বিদ্বান স্বামীর মন বোঝার মতো একটি মন ৪৯ বছরে তৈরি করতে না পারাই হলো আরতি দেবীর ব্যর্থতা। এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে [...] বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে বিত্তবান শ্রেণিগুলির মধ্যে পুরুষই হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং এই জন্যই তার আধিপত্য দেখা যায়, যার জন্য কোনো বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া; স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত। (এঙ্গেলস, ১৮৮৪: ২২৯)

স্বামীর ডিভোর্সের সিদ্ধান্তে আরতি দেবীর সম্মতি আছে কি না তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন—'সারাজীবন তিনি যা-ই চেয়েছেন তা-ই হয়েছে। ডিভোর্স যদি ওনাকে খুশি করে আমি তা-ই চাই।'

সম্পূর্ণ জীবন তিনি কাটিয়েছেন পরের ইচ্ছায়, তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার অভ্যেসটাও করতে পারেননি আরতি। জানাতে পারেননি তার যে বই পড়তে ভালো লাগে, উত্তম কুমারের সিনেমা বা খোয়াই ভালো লাগে। জানাতে পারেননি একটা বড় ডায়ালের ঘড়ির শখ তার কত দিনের। আর বিশ্বনাথ নিজের দিকটা দেখতে দেখতে স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছে তার হিসেব না চুকিয়েই বলে দিয়েছেন, তিনি 'এসব' থেকে মুক্তি চান।

হুমায়ূন আজাদ বলেছেন, পুরুষই বিয়ে ও সংসারের কর্তা। সেই সংসারে সার্বভৌম। তাঁর বিধানই সংসারে ধর্মগ্রন্থ। নারীটি ওই সংসারের পরিচারিকা। (আজাদ, ১৯৯৫: ২৩৩) আর এ কারণেই পুরুষদের কাজগুলোকে 'কাজ' হিসেবে ধরে নারী

সদস্যদের কাজকে ঝি'য়ের কাজ হিসেবে ধরে নিয়েছেন কর্তা, প্রভু কিংবা স্বামী বিশ্বনাথ।

'সারাদিন কী করো'

শান্তিনিকেতনে বিশ্বনাথ ও আরতির কথোপকথনে ফুটে ওঠে পুরুষের দীর্ঘদিনের সেই বক্তব্য : 'সারাদিন কী করো ঘরে?'

বিশ্বনাথ : তুমি ঠাকুরের কাছে চাও, যাতে তোমার আগে আমি চলে যাই, আমি তো সেটাই চাইছি। তোমাকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে আমি আগে আগে চলে যাবো।

আরতি : ৪৯ বছর বাদে! লোকে হাসবে তো! আমি তো স্বাবলম্বী!

বিশ্বনাথ : না তুমি স্বাবলম্বী নও। কোনোদিন ছিলে না। কতবার তোমাকে বলেছি লাইব্রেরিতে কাজ কর। তার জন্য ফর্ম এনে দিয়েছি। তুমি না সই করেছো। না কখনো গিয়েছো। যেতে চাওনি কোনোদিন।

আরতি : সংসারটা কে করত!

বিশ্বনাথ : সংসার চলতো না! বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার। কোনোদিন ব্যাংক-এ গিয়েছো? টাকা তুলেছ? (আরতি মাথা নাড়ছেন) কোনোদিন ব্যাংকের লকার খুলে তা দিয়ে কিছু বের করেছো? কিছু রেখেছ? রাখোনি। তোমার কটা এফডিএস আছে? তোমার ইন্স্যুরেন্স এর কত টাকা ভরতে হয় বছরে, কোনোদিন খবর নিয়েছ? নাওনি।

স্ত্রী : কেন জানতে যাবো! বাইরেরটা তুমি সামলাবে, ভেতরটা আমি, তাইতো কথা ছিল? তুমি জান, রান্নাঘরে পাঁচফোড়ন কোথায় রাখা হয়, কালোজিরে কোথায় রাখা হয়? কনকের কত মাইনে? কত রকমের চাপাতা আসে এ বাড়িতে? তোমার পাতা চা, কাজের লোকেদের গুড়ো চা, বারীণের গ্রিন টি, জানো?

স্বামী : আমি জানতেও চাই না।

স্ত্রী : আমিও জানতে চাই না।

স্বামী : তোমার কাজটা একটা কাজের লোককে দিয়েই করিয়ে নেয়া যায়।

এতগুলো সন্তান জন্মদান বা লালনপালনকে কোনো ধরনের শ্রম হিসেবেও গণ্য করেন না বিশ্বনাথ। কেবলমাত্র নিজের প্রকাশনার কাজ, বিদ্যার্জন আর সাহিত্যিকদের সাথে জ্ঞানগর্ভ আলোচনাই হলো তার কাছে বড় ধরনের কাজ। মল্লিকা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন, মাতৃত্বই নারীকে শ্রম থেকে সরে থাকতে বাধ্য করে। (সেনগুপ্ত, ২০১০: ১৩৩) সহজ স্বাভাবিক মাতৃত্ব যখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে, নারীর সবচেয়ে বড় সার্থকতা মা হওয়া— এই প্রচার যখন থেকে পল্লবিত হয়েছে পেছাতে পেছাতে নারী ক্রমশ বন্দি হয়েছে মাতৃত্ব-গৃহস্থালি চার দেয়ালের গণ্ডিতে, যার নাম অন্তঃপুর, হারেম, অন্দরমহল, প্রাইভেট ডোমেইন বা পরিবার। আরতি দেবীকেও দেখি শান্তিনিকেতনে গিয়ে মিলি আর পিউ'র সন্তানের ঠাকুমা হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। কৃষিসভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্ব ও গৃহশ্রমের এই চক্র ঐতিহাসিকভাবে ক্রমশ গৃহবন্দি ও পুরুষের পদানত করেছে; পুরুষের শ্রমের তুলনায় নারীর গৃহশ্রমকে খাটো করে দেখিয়েছে; এবং ক্রমশ লিঙ্গাশ্রয়ী শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতেই পিতৃতন্ত্রের জমি মজবুত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে *নারী* বই থেকে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য—

> গৃহিণীর কাজ হচ্ছে পুনরাবৃত্তির পর পুনরাবৃত্তি; আদর্শ গৃহিণী একই কাজ ফিরে ফিরে করে, প্রতিদিন করে, কাজ করতে করতেও তার কাজের শেষ হয় না। [...] পশ্চিমা সমাজে গৃহিণী বলা হলো একটি সুভাষণ, এটি তৈরি করা হয়েছে গৃহিণীর নিরর্থক কাজকে অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য। (আজাদ, ১৯৯৫: ২৪৫)

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে—বহুদিন ধরে চলে আসা এই প্রবাদকেই যেন সার্থক করতে চেয়েছেন পরিচালকদ্বয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করার মতো—

> মানুষ চলচ্চিত্রের প্রতি তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বর্ণ, লিঙ্গ [...] লিঙ্গ অভিজ্ঞতাভেদে চলচ্চিত্রের প্রতি আলাদা আলাদা প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। (লেহম্যান ও লুহরম, ২০০৩: ৫)

অর্থাৎ পুরুষের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাই নারীকে সংসারের সকল সুখের মূল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহ প্রদান করেছে।

স্বাবলম্বীর সংজ্ঞা কী?

স্বাবলম্বীর সংজ্ঞা কী দাঁড়ালো এই চলচ্চিত্রে তাই স্পষ্ট নয়। আরতি দেবীকে স্বাবলম্বী করতে গিয়ে দেখা গেলো বিশ্বনাথ ডিভোর্সের কথা ভেবেছেন। আলাদা হয়ে না থাকলে নাকি স্ত্রীকে স্বাবলম্বী করা সম্ভব নয়।

বিশ্বনাথের পুত্রবধূকেও যথেষ্ট স্বাবলম্বী দেখানো হয়, পিতার তুলনায় পুত্র বারীণকে আরও বেশি অসুখী মনে হয়েছে স্বাবলম্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও। বারীণ ও সুপর্ণা রক্ষিতের কথায় তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বারীণ সুপর্ণা রক্ষিতকে বলছে 'বউ আমাকে আগলি হিসেবে দেখে? আপনি কী দেখেন?' সুপর্ণা রক্ষিতের মতো একজন স্বাধীনচেতা কিংবা স্বনির্ভর নারী বারীণকে বলছেন, 'সুশ্রী'। তার এ কথা বলার ভঙ্গিটাই যেন বিশাল ইঙ্গিত বহন করছে।

তাহলে কি একই সাথে স্বাবলম্বী হওয়ার পজিটিভ ও নেগেটিভ দিক তুলে ধরলেন পরিচালকদ্বয়।

চিত্র-৩ : *বেলাশেষে* জ্যোতির যৌনাকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশে বিরক্ত কাবেরী।

নারীদের স্বাবলম্বী হবার একমাত্র অবলম্বন হতে পারে পুরুষের অধঃস্তন থাকা কিংবা সেলাইকল অথবা শিক্ষকতা। উদাহরণ দেয়ার জন্য এক *বেলাশেষে* (২০১৫) চলচ্চিত্রই যথেষ্ট। আরতি দেবী স্বাবলম্বী হয়েছেন নারীদের সেলাই শিখিয়ে। পুত্রবধূ স্বাবলম্বী হয়েছেন বুটিক হাউস দিয়ে। পুত্রবধূর চরিত্রটিকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা কোনো সুপার শপ অথবা আইটি শপের মালিক হিসেবেও দেখানো যেত। পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রের সাথে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এই দিকটার মিলও লক্ষণীয়। মাহমুদা চৌধুরী তার 'চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী' প্রবন্ধে বাংলা চলচ্চিত্রের মায়েদের দু'ভাগে ভাগ করেছেন—

> একটা হলো মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মা সর্বংসহা ধরণীর মতো। অর্থকষ্ট আর দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে একা একা লড়াই করতে গিয়ে বাধান যক্ষা-কাশি। জীবিকা হিসেবে থাকতে পারে সেলাইকল ও শিক্ষকতা। [...] কিন্তু সব ছবিতেই শিক্ষিকা, আধুনিক, বিত্তবান নারী চোখে সানগ্লাস আর হাতে ব্যাগ নিলেই ধরে নিতে হবে যে সে ভয়াবহ মা, এটা যথার্থ নয়। (চৌধুরী, ২০১০: ৭৯)

মূলত বিশ্বজিৎ মজুমদার অতি মহান (!) উদ্দেশ্যে আরতি দেবীকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছেন, আরতিকে স্বাবলম্বী করাই ছিলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় বিবাহ বিচ্ছেদকে বিবাহের মতোই একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। বিবাহবিচ্ছেদ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজের সামাজিক পরিবর্তনের এবং বাঙালি নারীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতির একটি সনদ হয়ে ওঠে। ভারতের খ্রিস্টান ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় চালু হলেও পারিবারিক ক্ষেত্রে 'সবচেয়ে চরমপন্থি সমাজসংস্কার পদক্ষেপ' হিসেবে বিবাহবিচ্ছেদ আইন ভারতের সর্বস্তরে চালু হয় পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯৫৪-এর দি স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট ও ১৯৫৫-এর দি হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টের মাধ্যমে। এর সাথেই নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একবিবাহ বা মনোগ্যামাস বিয়ের আইন চালু হয়।

বিশ্বনাথ-আরতির বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কথা উঠতেই দেখা যায় বারীণের স্ত্রী শর্মী বারীণকে বলছে, মা কে তো এখন আমাদেরই রাখতে হবে। বোনদের কোনো দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না দাবি করে শর্মী। আরও বলেন সংসারের টাকা এখন তিনভাগে ভাগ হবে। বাবার আলাদা, মায়ের আলাদা আর তাদের আলাদা। অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে কি হয়নি তার আগেই নারীটি কোথায় থাকবে বা তিনি যে গলগ্রহ হয়ে গেলেন তা নিয়ে আলোচনা। অথচ বিশ্বনাথ ঠিক করে রাখলেন স্ত্রীকে ফেলে তিনি শান্তিনিকেতনের বাড়িতেই থাকবেন। বিবাহবিচ্ছেদ করার উদ্দেশ্য আরতি দেবীকে স্বাবলম্বী করা হলেও স্বাবলম্বী হবার পথটির জন্যও তাকে মুখাপেক্ষী হতে হচ্ছে স্বামীর বা পুত্রের। সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার তার নিজের যেমন কোনো অধিকার নেই, অধিকার নেই তার মেয়ে সন্তানদেরও।

নারীর শত্রু নারী

এই চলচ্চিত্রের একটা বড় দিক নারীকেই নারীর শত্রু হিসেবে তুলে ধরা। বিশ্বজিৎ বাবু স্ত্রীকে বলছেন বেশিরভাগ মেয়েদের ঘর ভাঙে তাদের মায়েদের জন্য। এমনকি একমাত্র ছেলে বারীণের দাম্পত্য কলহ নিয়ে আরতি বিশ্বনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বিশ্বনাথ বলেন 'আমি কাউকে কিছু বলতে পারবো না।' অর্থাৎ এখানেও মাকেই সবকিছু দেখতে হবে স্বামী মহাপুরুষটি (!) সন্তানদের জীবনের কোনো দায়িত্ব নেবেন না।

এমনকি যাবতীয় কূটকৌশল করতে দেখা গেছে চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলোকে। প্রতিবেশী নারীকে দেখা গেছে শাড়ি কেনার নাম করে বিশ্বনাথ-আরতির ডিভোর্স কেন হচ্ছে সেটা জানতে চাইছেন। অথচ কোনো পুরুষ প্রতিবেশীর এ রকম কোনো উৎসাহ চোখে পড়লো না।

বিশ্বনাথ কেন ডিভোর্স দেবেন আরতিকে, সে প্রশ্ন মিলি যতটা আক্রমণাত্মকভাবে করেছে, বারীণ করেছে ততটা শান্ত ও ভদ্রভাবে। বারীণের স্ত্রী বারীণের সাথে মিসেস সেনগুপ্তকে নিয়ে ঝগড়া করলেও মিলির স্বামীকে দেখা গেছে মিলিকে তার প্রেমিকের সাথে চুমু খেতে দেখেও চুপ করে থাকতে। তাঁকে ধৈর্যশীল ও ভালোত্বের চরমে দেখানো হলেও বারীণের স্ত্রী শর্মীকে দেখানো হচ্ছে ঝগড়ুটে হিসেবে। এমনকি কাবেরীকে দেখা গেছে স্বামী জ্যোতির সাথে কথায় কথায় ঝগড়া করতে।

হাঁড়ি, চুড়ি আর সংসারের স্বপ্নই নারীর একমাত্র অবলম্বন

গেম খেলার দৃশ্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখি মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হতে চায়, সালমান খানের সাথে দেখা করতে চায়। আরতি দেবী নিজের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি দেখতে চান। বিশ্বনাথ বাবু কিংবা বারীণের ইচ্ছের দিকে তাকাই, তারা বই প্রকাশ করতে চান কিংবা দেশের বাইরে কোথাও যেতে চান। এমনকি স্বাধীনচেতা নারীর প্রতিচ্ছবি মিলি (ঋতুপর্ণা) কে দেখি মায়ের গয়না চাইতে, এর মানে নারীরা যেমনই হোক না কেন গয়না, পোশাক এগুলোই হচ্ছে তাদের স্বপ্নের বিষয়। মিলির স্বামী যেতে চায় অস্ট্রিয়ার কোনো এক কনসার্টে। বারীণের স্ত্রী শর্মী যেতে চায় কোপাই নদীর ধারে, নিজের ব্যবসা নিয়েও তার কোনো স্বপ্ন নেই। অথচ স্বামী বারীণ চায় বই লিখতে। পিউ চায় 'জাব উই মেট'-এর কারিনার চরিত্রের মতো জীবন ধারণ করতে। প্রসঙ্গক্রমে জাব উই মেট' চলচ্চিত্রের কথাটাও আসে। সেখানে কারিনা শিক্ষিতা তরুণী যিনি ভালোবাসার মানুষের কাছে যেতে পরিবার ছেড়ে চলে যান, বন্ধু শাহিদ কাপুরের সাহায্যে। কিন্তু সেই প্রেমিক তাকে অস্বীকার করলে শহর থেকে দূরে কোনো এক মিশনারি স্কুলে কাজ করা শুরু করেন। সেখান থেকে শাহিদ কাপুরই তাকে খুঁজে বের করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং তাকে বিবাহ করে

চিত্র-৪ : *বেলাশেষে* চলচ্চিত্রে মধ্যমণি 'পুরুষ' প্রোটাগনিস্ট, তাঁকে ঘিরেই আরতির 'সংসার'

উদ্ধার (!) করেন। পিউ'র মোবাইলের রিংটোনও তাই; অর্থাৎ চিত্রপরিচালক নিজেই চাইছেন সিনেমার গড়পড়তা চরিত্র হতে। তাছাড়া তাকে দেখা যায় ছবির সেটে স্বামীর ধমক খেতে। অর্থাৎ এখানে স্বাধীন হয়েও তিনি অধঃস্তন। তাঁর স্বপ্নের চরিত্রে কাজ করার কথা বলার মাধ্যমে এ বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। অথচ পিউ'র স্বামী চান অ্যাঞ্জেলিনা জোলিকে দিয়ে নিজের সিনেমায় অভিনয় করাতে। অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা কিংবা শিল্প সবকিছু নিয়ে আগ্রহ পুরুষেরই বেশি। নারী সেখানে নিগৃহীত। নারীর একমাত্র আগ্রহ তার সংসার কিংবা সেবাধর্মী পেশা অথবা গয়নায়। কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান বা শিল্পসাধনায় তাদের আগ্রহ নেই। তাদের সবকিছু সংসারকেন্দ্রিক, বাস্তবতা বিবর্জিত।

বছর শয়েক আগে বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া বলে গেছেন—

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্রমালা বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্য মণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন। (রোকেয়া, ২০০৬ : ২৮)

আদালতে যাওয়ার আগে মা'কে মেয়েদের মেকাপ দিয়ে দেয়া আর বাবার জুতো খোঁজা দেখলেই বোঝা যায়, পরিচালকরা নারীদের ঐতিহ্যগত ভূমিকায় সন্তুষ্ট। এ কারণে জীবনের এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নিতে যাওয়ার আগে মায়ের প্রয়োজন হচ্ছে মেকাপ নেয়ার। শত বছরেরও বেশি আগে বলে যাওয়া মেরি ওলস্টোনক্র্যাফটের একটি বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য—

> শিশুবেলা থেকে শেখানো হয় যে রূপই নারীর রাজদণ্ড, তার মন বেঁকে যায় তার দেহের আদলে, এবং এর কারুখচিত খাঁচার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সাজাতে শেখে শুধু কারাগারটিকে (উদ্ধৃত মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট, আজাদ, ১৯৯৫: ১৬৫)।

ক্যামেরার পুরুষালী চোখ

ক্যামেরার পেছনে আছেন শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা। অর্থাৎ তাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী। কিন্তু ক্যামেরার চোখটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শুধুমাত্র পুরুষালী দৃষ্টিভঙ্গিতে। কাবেরীর স্নান থেকে বের হওয়ার সময়ে তার খোলা পিঠ দেখানো। যেন জ্যোতির আকাঙ্ক্ষার চোখ দিয়ে দর্শক দেখছে কাবেরীর পিঠ। সেই পিঠের কথা এবং সে সময়ের শটটি পরে জ্যোতির কথাতেই পরিষ্কার হয়। জ্যোতি তাঁর শ্বশুর বিশ্বনাথকে বলছে, আপনার মেয়ে যখন স্নান করে বের হয় না, তখন ওর খোলা পিঠের দিকে তাকালে সব ভুলে যাই।

চলচ্চিত্র দর্শকদের নানা ধরনের তুষ্টি উপহার দেয়। এর মধ্যে একটি হলো দেখনপ্রিয়তা বা স্কোপোফিলিয়া। হকের (হক ২০০৭:১২৫) ভাষায় পুরুষ দৃষ্টি সুসজ্জিত নারী-শরীরের ওপরেই তার ফ্যান্টাসির প্রয়োগ করে। সনাতনী প্রদর্শনী ভূমিকায় নারী একই সঙ্গে দৃষ্ট ও প্রদর্শিত হয়।

এ কথার প্রমাণ মেলে পিউ ও পলাশের শ্যুটিং দৃশ্যে। নাতাশা নামে একজনকে নাইট গাউন পরিয়ে শ্যুটিং করানো হচ্ছে। আর সেই দৃশ্যে দেখা যায় পলাশ বার বার বলছে আরও আবেগ দিয়ে শ্যুটিং করতে আর ক্যামেরার তথা দর্শকের চোখ গিয়ে পড়ছে নাতাশার খোলা বুকে।

একই দৃশ্য চোখে পড়েছে মিলি ও তার প্রেমিকের চুমুর দৃশ্যে। সাধারণ সময়ের চাইতে কিছুটা খোলামেলা পোশাক পরা মিলির

চুম্বনদৃশ্যে ক্যামেরা ঠিক মিলির এক্সপ্রেশনকেই ধরেছে। অপরদিকে খুব একটা ক্যামেরা ঘোরায়নি।

যাবতীয় বুদ্ধির আধার পুরুষ, তাদের সব বুদ্ধি মেনে নেবেন নারীরা

আরতি দেবীর জন্য একজন নারী উকিল খোঁজা হলেও দেখা যায় যে, কোর্টে বিশ্বনাথের উকিলই বেশি কথা বলছেন। শেষ পর্যন্ত সবকিছু শুনে যে পরামর্শ দিলেন তিনিও একজন পুরুষ বিচারক। শুধু কি তাই? বিশ্বনাথ-আরতির শান্তিনিকেতনের বাড়িতে তাদের কামরায় গোপন ক্যামেরা লাগানো হবে। এ বুদ্ধিও এসেছে ছোটজামাই পলাশ-এর মাথা থেকে। অথচ পলাশের স্ত্রী পিউ নিজেও একজন ডিরেক্টর। যিনি কি না নিজের বুদ্ধিতে 'জাব উই মেটে'র নায়িকা চরিত্রের মতো হওয়ার স্বপ্ন দেখেই খালাস। কোথায় ক্যামেরা বসানো হবে, কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সবই ঠিক করেন পলাশ। পিউ'র কাজ শুধুই দেখে যাওয়া।

আধুনিক জ্ঞানে শিক্ষিত বিশ্বনাথ, নিজের দীর্ঘ বছরের প্রকাশনা বিষয়ক কাজকর্ম ছেলে বারীণকেই বুঝিয়ে দিয়ে যান শান্তিনিকেতন যাওয়ার আগে। কিন্তু কোনো মেয়েকেই তিনি প্রকাশনা বিষয়ে কিছু শিখিয়ে যাননি। এমনকি বড় মেয়ের কুসংস্কার বোধ নিয়েও তাকে তেমন কিছুই বলেন না বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের তিন কন্যার মধ্যে বড় কাবেরী যেন মায়েরই প্রতিচ্ছবি। তবে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে তিনি অতিমাত্রায় কুসংস্কার বা তাবিজ কবচে বিশ্বাসী। নিজে স্বামীর সাথে দিনরাত ঝগড়া করলেও দেখা যাচ্ছে বাবা-মায়ের সংসার রক্ষায় 'গুরু'র কাছ থেকে তাবিজ সংগ্রহ করতে গিয়েছেন তিনি। আর দিনে ৫ বার করে পূজাও দিতে চাইছেন। এত আধুনিক জ্ঞান সম্পন্ন পিতার ঘরে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েটি বেশ বেমানান। বিশ্বনাথ বাবু কী এর জন্য দায়ী নন? নিজের সন্তানদের ঠিক মতো সময় দেননি বলে তো সন্তানরাও তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারতো।

যৌনতা কেবলই পুরুষের আকাঙ্ক্ষা-নারীর প্রেমের নতুন সংজ্ঞায়ন

স্বামীর যৌনাকাঙ্ক্ষা বেশ অপছন্দ কাবেরীর। তাই বারবার নানা ছুতোয় তাকে জ্যোতি ছুঁতে চাইলেও সে আপত্তি জানায়। এ কারণে জ্যোতি নিজেকে বেশ বঞ্চিত মনে করে। একবার তাই বলে ওঠে গোপালকে যেভাবে সেবা করো না, তার ১০%ও যদি আমায় করতে।

স্বামীর পর্ণ ছবি দেখা নিয়েও শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে কাবেরী ঝগড়া করে। এমনকি জ্যোতিকে বারবারই তার অতৃপ্ত যৌনজীবন নিয়ে কথা বলতে দেখা যায় শ্বশুর কিংবা ভায়রাদের সাথে।

বিশ্বনাথ নিজেও তার যৌনজীবন নিয়ে সুখী নন। কোর্টে তিনি বলেন তারা এক ছাদের নিচে বসবাস করেন, তবে এক ঘরে নয়। স্ত্রী কেন নাতি-নাতনীদের সাথে একঘরে থাকেন তা নিয়েও অনুযোগ জানান শান্তিনিকেতন গিয়ে। অথচ এ প্রশ্নের উত্তরে আরতি দেবী চুপ করে থাকেন।

বিশ্বনাথ : আচ্ছা আরতি, আমাদের মধ্যে কি প্রেম ছিলো? নাকি শুধুই অভ্যাস? বিয়ের পর তুমি আমাদের বাড়িতে এলে, বাবার সমস্ত দায়িত্ব তোমার উপর এসে পড়লো। তারপর ছেলে-মেয়েরা আসলো, তাদের বড় হওয়া, দাদি-নানি হওয়া। আমি তোমাকে কতটুকু পেলাম? [...] আরতি : চান করে উঠে ভিজে তোয়ালেটা তুমি রেখে দাও। ঐ ভিজে তোয়ালেতে আমি চান করি। তোমার গন্ধটা পাই, ওটা আমার অভ্যেস। [...] খাবার পর যে মাছের ছালগুলো তুমি ফেলে দাও সেটা তুমি খাওনা, আমি কনককে বলি ওটা ফেলে না দিতে। ওটা আমি খাই, ওটা আমার অভ্যেস। [...] এখন যখন তুমি বাথরুমে যাও খুব গন্ধ হয়, বয়স হয়েছে তো। তোমার বউমা ওটা একদম সহ্য করতে পারে না। তুমি বাথরুম থেকে এলে আমি ঢুকে ভালো করে জল ঢেলে দেই। ওই গন্ধটা আমার ভালো লাহে। ওটা আমার অভ্যেস।

এই অভ্যেসগুলোই আমার কাছে প্রেম। এখানে হুমায়ূন আজাদের একটি কথা বলা যেতে পারে—

> নারীর জীবনে সাধারণত কাম আসে বিয়ের মধ্য দিয়ে, বিয়েই তাদের জন্য কামের কানাগলি। তবে নারীর বিয়ে নিজের কামের জন্য নয়, পুরুষের কামের জন্যে; নারীর বিয়ে নারীর আত্মরক্ষার জন্যে। (আজাদ, ১৯৯৫ : ২২৬)

আরতি তাই প্রেম-কামকে নিজের অভ্যাসের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। যেই পুরুষ তাকে সংসার নামক কারাগারে আটকে রেখেছেন, সেই পুরুষ কিংবা স্বামীটির প্রতি ভালোবাসা তাই আজ আরতির কথায় প্রকাশ পেয়েছে সংসারের নানা কাজের মধ্য দিয়ে। তবে পরিচালকদ্বয় নারীকে এতটাই অধঃস্তন দেখানোর প্রয়োজন ছিল কি? স্বামীর টয়লেটের গন্ধ কিংবা রেখে যাওয়া এঁটো খাওয়া কি এ যুগের জন্য বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়নি তাদের?

এমনকি তাদের আধুনিক দুই কন্যা মিলি ও পিউ'র সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন বোতলে পুরনো মদ। প্রেমিকের সাথে ডেটিংয়ে চুমু খেতে চাইছেন না মিলি ধরা পড়ার ভয়ে। তবে প্রেমিকের ইচ্ছেকেই নিজের ইচ্ছে হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। পিউ আর তার স্বামী অতি আধুনিক। সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা ব্যস্ত সময় পার করেন। অথচ যৌন আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি তাদের যে ভালোবাসা প্রয়োজন তা কেবল অনুধাবন করতে পারে পিউ। স্বামী নিজের যৌন পরিতৃপ্তি নিয়েই সন্তুষ্ট। তাই পিউ বলেন, আদর করা শেষ হলে দুজন দুদিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন।

শেষকথা

লক্ষী বাঈ, পুতলি বাঈ
আমার বউ শুচি বাঈ।

এ রকম ভয়ানক জেন্ডার অসচেতন কথাও *বেলাশেষে* (২০১৫) চলচ্চিত্রে বলানো হয়েছে কাবেরীর স্বামী জ্যোতির মুখ দিয়ে। হুমায়ূন আজাদ-এর ভাষায়—

> পুরুষপ্রজাতির সবাই অংশ নিয়েছে নারী বিষয়ে অন্তত একটি শ্লোক রচনায়। ওই সব শ্লোক অশ্লীল আবর্জনার মতো। [...] পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়। (আজাদ, ১৯৯৫: ১১২)

পুরুষের প্রতি লিঙ্গীয় পক্ষপাত থেকেই নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ করেছে পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল, পরনির্ভরশীল, বঞ্চিত, হিংসাত্মক, অবিশ্বাসী ও পাপী হিসেবে। সুস্মিতা চক্রবর্তী তাঁর 'ফোকলোর ও জেন্ডার' গ্রন্থে জেইলান হুসেন-এর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন—

> মৌখিক ঐতিহ্য সাধারণভাবে নারী-মাত্রকেই বোকা, দুর্বল, হিংসুটে, শয়তান, অবিশ্বস্ত, নির্ভরশীল, গুরুত্বহীন ও প্রলুব্ধকারী হিসেবে চিত্রায়িত করে থাকে। (চক্রবর্তী, ২০১৪: ১৯)

তাইতো দেখা যায় গ্রামের মৌখিক সাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, রূপকথা, গল্প, গান, নাচে নারীদেরকে সমাজের গঁৎবাঁধা ধারণার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়, শহুরে 'ভদ্রমানুষের' সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞাপন, নাটক চলচ্চিত্রেও নারীকে নির্মাণ করার প্রক্রিয়া ভাষার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন ডিসকোর্সের নামে অনুশীলিত হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষার প্রতি নারীদের আগ্রহ কিংবা শিল্প-সংস্কৃতি মনস্কতা বৃদ্ধি পেলেও মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন অসম্ভব নয়। এজন্য ভাঙতে হবে শৃঙ্খল।

নারীকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে সম্ভোগের সামগ্রী হতে এবং হতে হবে সক্রিয়, আক্রমণাত্মক। নিজের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করবে না। নারীর ভবিষ্যৎ মানুষ হওয়া, নারী হওয়া বা নারী থাকা নয়। (আজাদ, ১৯৯৫: ৩৭১)

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যখন নারীর জাগরণ এসেছে; আন্দোলন চলছে নারীর অধিকার আদায়ের, মেধার প্রতিযোগিতায় পুরুষকে পেছনে ফেলে নারীরা চলছে এগিয়ে, সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা বীরদর্পে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন সেখানে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদের মতো এমন আধুনিক চিত্রপরিচালকদের পরিচালনায় *বেলাশেষে* (২০১৫) চলচ্চিত্রে নারী কিংবা পুরুষের সনাতন ভূমিকা সত্যিই ভাবিয়ে তোলে।

চলচ্চিত্র পরিচিতি

চলচ্চিত্রের নাম	: *বেলাশেষে* (২০১৫)।
পরিচালনা	: নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখার্জি।
প্রযোজনা	: উইন্ডোজ প্রোডাকশন হাউজ; অতনু রায় চৌধুরী।
রচনা	: নন্দিতা রায়।
অভিনয়ে	: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অপরাজিতা আঢ্য, মনামী ঘোষ, শংকর চক্রবর্তী, সোহিনী সেনগুপ্ত, খরাজ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী দত্ত, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
মিউজিক	: অনুপম রায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়।
সিনেমাটোগ্রাফি	: গোপী ভগত।
সম্পাদনা	: মলয় লাহা।
প্রোডাকশন কোম্পানি	: উইন্ডোজ প্রোডাকশন কোম্পানি।
ডিস্ট্রিবিউশন	: ইরোজ ইন্টারন্যাশনাল, পিয়ালি ফিল্মস।

তথ্যসূত্র

১. আজাদ, হুমায়ূন (১৯৯৫), নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
২. উইমার, রজার ডি. এবং ডমিনিক, জোসেফ আর. (২০০৬), *মাস মিডিয়া রিসার্চ: অ্যান ইন্ট্রোডাকশন*, ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাবলিশিং কোম্পানি, ক্যালিফোর্নিয়া।
৩. এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ (১৮৮৪), দ্য অরিজিন অব দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রোপার্টি, এন্ড দ্য স্টেট, চার্লস এইচ কার এন্ড কোম্পানি, ক্যালিফোর্নিয়া।
৪. চক্রবর্তী, সুস্মিতা (২০১৪), *ফোকলোর ও জেন্ডার*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৫. চৌধুরী, মাহমুদা (২০১০), *চলচ্চিত্র মাধ্যমে নারী*, ফেরদৌস ও অন্যান্য (সম্পা.), জেন্ডার যোগাযোগ, বাঙলায়ন, ঢাকা।
৬. দাশগুপ্ত, ধীমান (বাংলা ১৪১০), *সিনেমার ভাষা*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।
৭. নাসরীন, গীতি আরা (২০০৩), *রূপালী পর্দার পুরুষ ও বিমুখ নারী দর্শক*, রোদেলা নিরুপমা (সম্পাদিত), ফ্ল্যাশব্যাক, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৭, ঢাকা।
৮. বেসিংগার, জিয়ানাইন (১৯৯৩), *এ ওমেনস ভিউ : হাউ হলিউড স্পোক টু ওমেন ১৯৩০-১৯৬০*, নফ, নিউইয়র্ক।
৯. মালভি, লঁরা (১৯৭৫), *ভিজ্যুয়াল প্লেজার ও ন্যারেটিভ সিনেমা : ইন ফিল্ম থিওরি এন্ড ক্রিটিসিজম*, ব্র্যান্ডি ও কোহেন (সম্পা.), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক।
১০. মিঠু, মাজিদ ও মানিক, মোহাম্মদ আলী (২০১২), *চলচ্চিত্রে মা : সর্বংসহা সর্বহারা জননী, তুমি মানুষ হওনি*, ম্যাজিক লণ্ঠন, সংখ্যা ২, রাজশাহী।
১১. রোকেয়া, বেগম (১৯৭৩), *'অর্ধাঙ্গী'*, আবদুল কাদির (সম্পা.), *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, পরিবর্ধিত সংস্করণ (২০০৬), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১২. লেহম্যানম, পিটার ও লুহরম, উইলিয়াম (২০০৩), *থিঙ্কিং অ্যাবাউট মুভিজ: ওয়াচিং, কোশ্চেনিং অ্যান্ড এনজয়িং*, উইলি-ব্ল্যাকওয়েল পাবলিশিং, যুক্তরাষ্ট্র।

১৩. সেনগুপ্ত, মল্লিকা (২০১০), *সাহিত্যের কোণঠাসা কন্যারা যখন ঘুরে দাঁড়ায় বাংলা উপন্যাসে নারী ও বিবাহবিচ্ছেদ*, ফেরদৌস ও অন্যান্য (সম্পা.), জেন্ডার যোগাযোগ, বাঙলায়ন, ঢাকা।

১৪. হক, ফাহমিদুল (২০১০), *নারীবাদী চলচ্চিত্র তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা*, ফেরদৌস ও অন্যান্য (সম্পা.), জেন্ডার যোগাযোগ, বাঙলায়ন, ঢাকা।

১৫. হক, ফাহমিদুল (২০১৩), *চলচ্চিত্র সমালোচনা : বাংলাদেশের সমসাময়িক চলচ্চিত্রের পাঠ*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

১৬. হল, স্টুয়ার্ট (১৯৯৭), *দ্য ওয়ার্ক অব রেপ্রিজেন্টেশন, রেপ্রিজেন্টেশন : কালচারাল রেপ্রিজেন্টেশন এন্ড সিগনিফাইং প্র্যাকটিস*, সেজ পাবলিকেশন্স, লন্ডন।

১৭. হায়াৎ, অনুপম (২০১৩), *গণমাধ্যম ও নারী*, সমাচার, ঢাকা।

18. Belasheshe, Web Address: https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%87_(%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0 (Accessed Date : 20th August).

১৯. বাংলাদেশে 'বেলাশেষে (২০১৫)' ভারতে 'ছুঁয়ে দিলে মন', ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, ওয়েব ঠিকানা : <http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=2213> (Accessed Date: 02 September, 2016).

20. Noorani, Reja (Bengali blockbuster 'Bela Seshe' completes 200 days Web Address: <http://timesofindia.indiatimes.com/entertainment/bengali/movies/news/Bengali-blockbuster-Bela-Seshe-completes-200-days/articleshow/49813294.cms> (Accessed Date: 04 September, 2016).

লেখক
শবনম জান্নাত
সিনিয়র লেকচারার
স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।
ই-মেইল: shabnamjannat2016@gmail.com
ও
নিশাত পারভেজ
লেকচারার
স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।
ই-মেইল : parveznishat@gmail.com

লেখা পাঠানো সংক্রান্ত তথ্য

লেখা গবেবষণামূলক ও শিল্পমানসমৃদ্ধ হতে হবে। পূর্বে প্রকাশিত রচনা জার্নালে প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না। লেখা অনধিক ৫,০০০ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে এবং A4 সাইজ কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসরণপূর্বক SutonnyMJ (বাংলা লেখার ক্ষেত্রে) ও Times New Roman (ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে) ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পোজ করতে হবে। প্রবন্ধের সফট কপি ডকুমেন্ট ও পিডিএফ উভয় ফরম্যাটে ই-মেইলে bfarchivebd@gmail.com ঠিকানায় এবং হার্ড কপি ডাক মারফৎ বা সরাসরি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে পাঠানো যাবে। সঙ্গে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঠিকানা, ই-মেইল ও ফোন নম্বর পাঠাতে হবে। প্রাপ্ত লেখা প্রাথমিক মনোনয়ন এবং বিশেষজ্ঞের মূল্যায়ন (রিভিউ) শেষে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও জার্নালে মুদ্রিত হলে লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নালে প্রকাশিত সকল লেখার স্বত্বাধিকারী হবে।

লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জি এবং লেখার মধ্যে রেফারেন্স ও টীকা প্রদানের নমুনা নিম্নরূপ–

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে। বইয়ের ক্ষেত্রে লেখকের নাম (প্রকাশের সাল), গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংখ্যা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। জার্নাল, সাময়িকী, জার্নাল বা সম্পাদিত গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা সংস্থা, প্রকাশের স্থান উল্লেখ করতে হবে। নমুনা–

১. আল দীন, সেলিম (১৯৯৬), *মধ্যযুগের বাঙলা নাটক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২. চৌধুরী, সুচরিত (২০০৬), 'সেদিনের ছবির কথা', মুহম্মদ খসরু (সম্পাদিত), *ধ্রুপদী*, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ, ঢাকা।
৩. চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে – পরিচালকের নাম, *ছবির নাম* (মুক্তির সন), ফরমেট, যে দেশে চলচ্চিত্রটি নির্মিত।
৪. ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ওয়েব ঠিকানা দিতে হবে।

রেফারেন্স

লেখার মাঝখানে রেফারেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাকেটের মধ্যে (লেখকের সংক্ষিপ্ত নাম, প্রকাশের সাল : পৃষ্ঠা সংখ্যা) উল্লেখ করতে হবে। নমুনা–

[...] অরণ্যের দিনরাত্রি-কেও কখনো সত্যজিতের রাজনৈতিক ট্রিলজির অংশ ভাবা হয়েছে। কলকাতা-ত্রয়ীর ছবিগুলির মতো এখানেও সত্যজিৎ সমকালীনতার অসঙ্গতিগুলো প্রকাশ করেছেন এবং মানবচরিত্র বিশেষভাবে পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ও ছবিই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। কাঞ্চনজঙ্ঘা-কে সত্যজিৎ তার পরবর্তীকালের অধিকতর রাজনৈতিক চলচ্চিত্রসমূহের পথপ্রদর্শক হিসেবেই বর্ণনা করেছে (টমসেন, ১৯৭২-৭৩: ৩২)।

টীকা

বিদেশী কিংবা অপরিচিত শব্দ ও পরিভাষা (Term) ব্যবহারের ক্ষেত্রে টীকা বা ফুটনোট ব্যবহার করতে হবে। লেখার মাঝখানে ফুটনোট অথবা টীকা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানে ওপরের দিকে নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করে পৃষ্ঠার শেষে টীকা বা ফুটনোট সংযোজন করতে হবে। নমুনা–

'সর্বভারতীয়' সিনেমা হিসেবে হিন্দি সিনেমার নব নির্মাণ সে প্রকল্পেরই সম্প্রসারণ।[১] পাশাপাশি অন্যান্য ভাষায় তৈরি ছবির কপালে জুটল আঞ্চলিক তকমা। ... বলা বাহুল্য, এ এক ধরনের সাস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ, যা স্বাধীনতা-পরবর্তী নয়া উপনিবেশবাদী প্রকল্পের অংশ।[২]

---

১. অবশ্য এসবের ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছিল অনেক আগে থেকেই। ১৯৩৯ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার কংগ্রেস-এ একটি প্রস্তাবে চলচ্চিত্র প্রযোজকদের কাছে অনুরোধ জানানো হল হিন্দুস্তানি ভাষার প্রসারের স্বার্থে তাঁরা যেন অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ছবি তৈরি করা বন্ধ করেন। [...] তখন এটি ছিল তাঁদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রকল্পেরই অংশ। স্বাধীনতার পরে সেটিই অন্তর্ভুক্ত হল জাতীয় পুনর্গঠন প্রকল্পে।

২. উপনিবেশবাদের ধ্রুপদী প্রকল্পে একটি রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের বাণিজ্য সহযোগীরা অন্য একটি ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু আঠারো, উনিশ আর বিশ [...] রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তারপরেও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি প্রাক্তন উপনিবেশগুলিতে সহযোগী রাজনৈতিক অথবা ক্ষেত্রবিশেষে জনগোষ্ঠীর সাহায্যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও নিতান্ত কম থাকে না।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য মন্ত্রলালয়
১২১ কাজী নজরুল ইনলাম এভিনিউ
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।